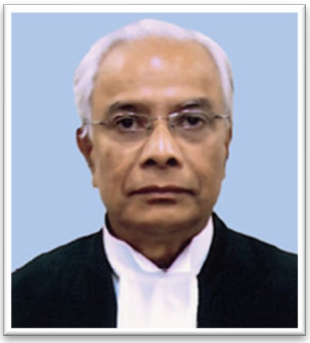

Dignity and Justice for all of us

Justice Md. Fazlul Karim
Appellate Division

বিধাতা তার বিধি অনুযায়ী মানুষ-জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম ও বর্ণের কোন বিভেদ সৃষ্টি করেনি। আজকের এই অশান্ত বিশ্বে জাতীয় জীবনে নাগরিকদের মানবাধিকার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আর সেই অধিকার বলবৎ রাখার মানসে একটি বিধিবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারের মাধ্যমে দেশে দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ করার প্রয়াস চলছে। তাই আজ আধুনিক ও সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকার সংরক্ষণ মানুষের একটি বিশেষ প্রয়াস।

সাধারণতঃ মানবাধিকার বলতে আমরা সেই অধিকারের কথাই বুঝি 'যা মানুষের মৌলিক অধিকার আর সে অধিকার নিয়েই মানুষ দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করে' যা তার জন্মগত অধিকার। কিন্তু আধুনিক যুগে ও সভ্য সমাজে মানবতার চরম উৎকর্ষতা সত্ত্বেও যুগে-যুগে, কালে-কালে এবং দেশে-দেশে মানুষ সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাই সভ্য সমাজে কোন কোন দেশে সে অধিকার তাদের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে অধিকার বল এর জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করেছে।

সমাজ ও সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সংরক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশ্বব্যাপী মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সার্বিক অধিকার আদায়ের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে মানবাধিকার পরিগণিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি দেখে মানব জাতিকে রক্ষা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সনে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানবজাতিকে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার করা হয় এবং পরবর্তীতে অনেক চড়াই উৎড়াই পার হয়ে ১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights) গৃহীত হয় যা অসহায়, নির্যাতিত মানুষ এবং আদিবাসীদের জন্মগত অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানে হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত এবং আত্মমানবতার রক্ষাকবচ হিসাবে মানব সমাজে সমাধিক গৃহীত।

তারই ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে লিখিত সংবিধান গ্রহণ করেছে সেইসব সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির কথা বলা হয়েছে যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের বিষয়বস্তু আর তৃতীয়ভাগে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে যা রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার তথা নাগরিকদের রক্ষাকবচ। আমাদের সংবিধান রচনা ও লিপিবদ্ধ কালে বাংলাদেশে জনগণ একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকালে গণপরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ বলিষ্ঠকণ্ঠে অঙ্গিকার করেন যে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে "গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।"

আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে মানব সত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

তাছাড়া অনুচ্ছেদে ২৫ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়নের আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত আছে।
বাংলাদেশ গোড়া হতেই মানবাধিকারে বিশ্বাসী এবং ইহাকে রাষ্ট্র পরিচালনারও মূলিনীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের জন্মগত অধিকার ও গঠনতন্ত্রের মূলনীতির আদর্শে বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং এর প্রক্রিয়ায় মানবাধিকারের সুষ্ঠ প্রতিফলন আমাদের রাষ্ট্রের নৈতিক ও আইনী দায়িত্ব।

রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর মানবাধিকারের সংরক্ষণ অনেকটা নির্ভরশীল। একটি দারিদ্রক্লিষ্ট দেশে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থানের অভাব যতটা আমরা অনুভব করি হয়ত একটি উন্নত দেশে সেভাবে অনুভূত হয় না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর এসব অধিকারের নিশ্চয়তা নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট, ফলে আপামর জনগোষ্ঠী দারিদ্রতা ও অভাবের মধ্যে দিন কাটায় সেটা হয়ত উন্নয়ত দেশের বেলায় ততটা প্রযোজ্য নয়। আমাদের মত একটি দরিদ্র ও অনগ্রসর সমাজে মানবাধিকারের শত্রু অনেক। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে দারিদ্র ও নিরক্ষরতা। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী জন্মগ্রহণ করে দরিদ্রতা কাঁধে নিয়ে এবং সেভাবেই তাদের সারা জীবন কেটে যায়। অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে মানবাধিকারের মর্ম কি তা তারা বুঝতে পারে না কারণ তারা শুধু গরীবই নয় তারা অশিক্ষিতও বটে। অশিক্ষা ও দরিদ্রতা সমাজের অসমতার মূল কারণ। যার জন্য সমাজের পদে পদে মানবাধিকার লংঘিত ও পদদলিত হচ্ছে। মানবাধিকারের কথা সংবিধানে বলা আছে, আইনেও বলা আছে কিন্তু সমাজে অসমতার জন্য মানবাধিকার লংঘন প্রবল ও প্রকট আকার ধারণ করেছে। মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের। কারণ মানবাধিকারের যে সমস্যা সেটা মূলতঃ অশিক্ষা ও অসচেতনতা থেকে উদ্ভুত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে চেয়ারম্যান পদে যোগদানকালে মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী 'সকলের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের ভয়-ভীতি অথবা আনুকূল্যের উর্ধ্বে থেকে কাজ করা উচিত' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর এ লক্ষ্যে সকলকে মানুষের অধিকার লংগনের প্রতিকার কল্পে সর্বস্তরের জনগণের সদাজাগ্রত সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে 'মানুষ হিসাবে যদি তারা তাদের অধিকার ভোগ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অর্থপূর্ণ জীবন ধারণ করতে পারে না।'

সর্বকালের আর সর্বমানুষের তথা মানবতার মুক্তি সনদসমূহ, যথা- মদিনা সনদ, মেঘনাকার্টা, Bill of Rights ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত আছে। মানবাধিকারের ধ্যান-ধারণা, যেটা বিশ্ব মানব অধিকার সনদে ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে। সেটা মূলতঃ উপরোক্ত সনদ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর 'Rights of Man' এর পুনরুক্তি মাত্র। ইংরেজ রাজনৈতিক দার্শনিক John Locke তার মতবাদে "Natural Rights" এর কথা বলেছেন। পরবর্তীতে American Declaration of Independence এ President Thomas Jafferson এটাকে "Inalienable Rights" বলেছেন। আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের দুই শতাব্দী পর "The rights of man" ক্রমান্বয়ে Human Rights এ পরিণত হয়। আমাদের স্মরণ আছে ১৯৫০-১৯৬০ দশকেও আমেরিকায় সিভিল রাইটস এর প্রবক্তাগণ গণমানুষের মৌলিক অধিকার, ভোটাধিকার, শিক্ষা ও বাসস্থান এর সমতা দাবি করে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে সিভিল রাইটস এর প্রবক্তা মার্টিন লুথার কিং সেই প্রেক্ষিতে বলেছেন "I have a dream" কিন্তু আততায়ীর গুলিতে উনার সেই স্বপ্নের পর্দা ছিড়ে গেলেও পরবর্তীতে সেই আন্দোলনের সূত্র ধরে এই শতাব্দীর শুরুতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ জনাব বারাক এইচ ওবামা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিবর্তনের সাথে সাথে মানবাধিকার নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী চলছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৩০টি অনুচ্ছেদেও মানবাধিকারের মূল কথাই বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

অনুন্নত দেশে এবং বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের পটভূমিতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। আমাদের দেশের তরুণ-যুব সমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে অনেকটা বাধ্য হয়ে, চাঁদাবাজী, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস ইত্যাদির মত নানাবিধ অসামাজিক ও অমানবিক

কর্মকা- লিপ্ত রয়েছে। যার ফলে সাধারণ নিরীহ নিরাপরাধ লোকের জীবন অতিষ্ঠ ও দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কর্মকা-, সংঘবদ্ধ সহিংসতা, রাজনৈতিক বিরোধ এবং অপরাধীদের অত্যাধুনিক অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের ফলে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিরীহ নিরাপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। নিরীহ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকে সামগ্রিকভাবে সন্ত্রাস দমনে সহায়তা করার সময় এসেছে।

সমাজে ও গণমানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা মানবাধিকারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সে প্রেক্ষিতে দ্রুত বিচার সুনিশ্চিত করাও বিচারক, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের একটা নৈতিক দায়িত্ব। আমি মনে করি মানবাধিকার সংরক্ষণে আইনজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর সর্বক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপের ভূমিকাও এখন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের কারাগারে বিচারাধীন অপরাধী ও সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা অত্যন্ত করুণ, শোচনীয় ও মানবেতর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। প্রত্যেক কারাগারে বিচারাধীন অপরাধীর সংখ্যা সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর থেকে অনেক বেশী। তাই বিলম্বিত বিচারের জন্য মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে ও ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হচ্ছে।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় নারী ও শিশুদের বিভিন্ন নির্যাতনের কথা আমরা জানি। লিঙ্গ ইস্যুতে সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে সকলকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। এই দেশে নারী সমাজ পুরুষের চাইতেও বেশী। আমাদের দেশেও বর্তমানে পুরুষের তুলনায় নারী ভোটারের সংখ্যা ১৪,০০০ বেশী। নাগরিক হিসাবে নারীর প্রতি পুরুষের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যাতে তারা দারিদ্র, শিক্ষার অভাব ও সুযোগের অসমতার কারণে দুর্ভোগের শিকার না হয়। বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য বেশ কিছু আইন আছে আর এই আইনগুলো আরও সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগ করা আজকের দাবী। বিশ্বে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ ও বিভিন্ন সংস্থা ও সংশ্লিষ্টরা নারীদের অধিকার সংরক্ষণে বলিষ্ট ও ফলপ্রসূ ভূমিকায় প্রয়াসী এবং সেই লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত আছে। তাদের সেই শুভ প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান ও ফলপ্রসূ করার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিভিন্ন সচেতনতা মূলক সভা, সেমিনারও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি করতে পারেন। এছাড়া আদালতের বাইরেও বিরোধ নিস্পত্তি, সালিসী ও মধ্যস্থতার মত বাস্তব-সম্মত কাজে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার ও নাগরিক পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অতন্ত্র প্রহরীর কাজ করতে হবে।

সমাজে মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব আদালতেরও আছে। যেখানে মানবাধিকার সংরক্ষণে আইনগত কোন বিধান নেই সেখানেও আদালত সমাজের বিবেকের সংরক্ষক হিসেবে নৈতিক মানদ- কার্যকরী করার জন্য আইনের পরিধির ব্যাপকতা নির্ণয় করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নৈতিক নির্দেশ দ্বারাও সরকারকে সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী আইন প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আপামর জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে অতন্দ্র প্রহরী আর সদা জাগ্রত আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন সমাজ আইনের প্রয়োগ ও আইনের শাসন কায়েমে সচেষ্ট হবেন। জনগণের মধ্যে শুভবুদ্ধি উদয় হবে, মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশ সকলের জন্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হবে এই প্রত্যাশা গণমানুষের।

সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের স্বীয় সংবিধান প্রণয়নের সময় মানবাধিকার নীতির বিশেষ অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়। যুগে যুগে, দেশে দেশে তাই মানবাধিকার বাস্তবায়ন সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ বর্তমানে প্রচলিত আছে। ২০০৮ সালে মানবাধিকারের ৬০ তম বিশ্ব মানবাধিকার বর্ষ উদযাপিত হয় যার প্রতিপাদ্য বিষয়

“Dignity and Justice for all of us” (আমাদের সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যায়বিচার) যাহা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অগ্রগতির হাতিয়ার হিসাবে মানবাধিকার সনদ হিসাবে সমধিক সমাদৃত ।

সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশে অনেক মানবাধিকার সংস্থাও দীর্ঘ দিন ধরে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে । তাহলে সেদিন সুদূর পরাহত নয় যেদিন মানবতা অবহেলা, অনাদর ও অব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে পদদলিত হবে না ।

------❖------